স্বপ্নের মানুষঃ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

খন্দকার জাহিদ হাসান

বিদায় বাংলাদেশ! আবার কবে তোমার শ্যামল কোলে ফিরে আসব জানা নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী বিকেলবেলা যথাসময়েই বৈশাখী তান্ডব শুরু হল। হেঁটে চলেছিলাম। তবে আনমনে নয়। পুরোপুরি সচেতনভাবেই হাঁটছিলাম। এ সচেতনতা কালবোশেখীকে ঘিরে। এ মনোযোগ আসন্ন দেশত্যাগকে সামনে রেখেই। কে জানে এমন চিরপরিচিত দুরন্ত ঝড়ের দেখা আবার কবে পাব!

আজন্ম কেটে গেল কালবোশেখীর দেশে। কতোকালের চেনা এই কালবোশেখী মাঝে মাঝেই কোথা থেকে যেন আচম্‌কা বয়ে নিয়ে আসে শাপলার গন্ধ, হাটুরেদের কোলাহল, একাত্তরের স্মৃতি কিংবা গ্রাম-গঞ্জের টাট্‌কা খবর। অভিবাসনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে দেশটিতে যাচ্ছি, সেখানেও কি এমন ঝড় বয়ে যায়? হয়তো যায়। তবে অচেনা সেই ঝড়ের বুকে কান পেতে নিশ্চয় শোনা যায় না বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ আর মুক্তিযুদ্ধের গান।

মীরপুরের লোকালয় ছেড়ে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত বিরান অঞ্চলের দিকে হেঁটে চলা। অনতিদূরে মীরপুর চিড়িয়াখানার চৌহদ্দি-বেড়া। হঠাৎ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ডাক ভেসে এল। তবে ঝড়ের গর্জনের মাঝে সেই আওয়াজ নিমেষেই হারিয়ে গেল। ঝড় সামান্য কম্‌ল বোধ হয়। ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল। তা নামুক। প্রচন্ড ঠান্ডা জলের ঝাপ্‌টায় শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কাঁপুক। কতোদিন আর এমন 'স্বদেশী বৃষ্টি'-তে ভেজা হবে না, কে জানে! ছাতা-বগলে বোতল-হাতে উল্টোদিকে ছুটন্ত এক হাবাগোবা মানুষ অবাক চোখে আমাকে প্রশ্ন করল- 'এই তুফানের মইদ্যে একা একা উইদিকে কই যান?' জবাবে কিছু না বলে শুধু একটু হাসলাম।

বৃষ্টিতে হেঁটে চলেছি। কোনো গন্তব্য নেই। নিশিকান্তও একদিন এভাবে বৃষ্টিতে হেঁটে চলেছিল। তার অবশ্য একটা গন্তব্য ছিল। সে যাচ্ছিল তার মনিব-গিন্নী বউমণির জন্য চুয়া আনতে। হঠাৎ আমার ধন্দ লাগল- আচ্ছা, এইমাত্র যে লোকটা পাশ কেটে গেল, সে নিশিকান্ত ছিল তো! হয়তো পল্‌তাবেড়ের নয়, হয়তো ঢাকার মীরপুরের অন্য কোনো নিশিকান্ত? এই ঘোর বাদলার মাঝেও যে আহম্মকটা বগলের ছাতা বগলেই রাখে, সে নিশিকান্ত বই অন্য কে আর হবে!

কতোক্ষণ বৃষ্টিতে ঘুরেছিলাম ঠিক মনে নেই। সম্ভবতঃ সময় এক জায়গায় থেমে ছিল। অথবা এক লাফে হয়তো মাঝ রাতে গিয়ে পৌঁছেছিল। চারিদিকে আর কোনো ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই। কোনো অনুভূতিও নেই। চেনা পৃথিবীটাও গায়েব হয়ে গেছে। পায়ের নীচে মাটি নেই, মাথার ওপর আকাশও নেই। আলো নেই, আবার অন্ধকারও নেই।.... হঠাৎ কোথা থেকে কে যেন একজন উদয় হল। সে সরাসরি আমার দিকেই মুখ করে ছিল। কিন্তু তা বলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল না। লোকটাকে চেনা চেনা লাগল। নিশিকান্ত না! বগলের ছাতাটি যথাস্থানেই ছিল। হাতেও ছিল সেই চুয়ার বোতল। মনিবগিন্নী বউমণির জন্য চুয়া আনতে হবে তাকে। এতক্ষণে নিশ্চিত হলাম। এ তো নিশিকান্তই। ভ্যাবলাকান্তও বটে! আমাকে উদ্দেশ্য করে ও কি যেন বলছিল। আগে থেকেই জানতাম যে, তার মাথার স্ক্রু কিছুটা ঢিলে। একা একা বকার অভ্যেস ছিল তার। তাই গা করলাম না। তবু দারুণ অস্বস্তিতে মনটা ভরে গেল। ডান হাতটা তুল্‌লাম, 'বিদায় নিশিকান্ত! ভাল থাকবেন।'

এবার নিশিকান্তর পরিষ্কার গলা শোনা গেল, 'আমার মতো সামান্য মানুষকে 'আপনি' করে বলছেন। আপনি বড়ো ভাল মানুষ তো!' আমি হাসলাম, 'আপনি আরও অনেক বেশী ভাল। ইয়ে, আপনার মনিবকেও আমার বিদায় জানিয়ে দেবেন।' নিশিকান্ত মাথা চুলকাল, 'আপনি কি বউমণির কথা বলছেন? নাকি তেনার

বর বিপিনবিহারীর কথা?' তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকালাম, 'না-না, বউমণি নয়, বিপিনও নয়, স্বয়ং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছি।' নিশিকান্ত জিভ কাটলো, 'উনি আমার মনিব হতে যাবেন কেন! উনি তো সাহিত্যিক মানুষ। আমার স্রষ্টাও বটেন।' বল্‌লাম, 'সে যা-ই হোক, উনাকে বিদায় জানাবেন।' নিশিকান্তর ব্যাখ্যা, 'দেখুন, আমি দ্বিমাত্রিক সত্তা। আর উনি হলেন ত্রিমাত্রিক জগতের লোক। আমার পক্ষে উনার সাথে যোগাযোগ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।' আমার যুক্তি, 'আমিও তো ত্রিমাত্রিক। তাহলে আপনি কিভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছেন?' নিশিকান্ত মাথা দোলাল, 'এই মুহূর্তে আপনি আর ত্রিমাত্রিক নন, আপনি আমার স্তরে অর্থাৎ দ্বিমাত্রায় নেমে এসেছেন। সে কারণেই....।' নিশিকান্তর কণ্ঠ ক্ষীণতর হতে থাকল। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই বোকাসোকা কিঞ্চিৎ মানসিক প্রতিবন্ধী গোছের লোকটা আবার এত জ্ঞান কবে থেকে লাভ করল! নিশিকান্তর কণ্ঠ থেমে থেমে প্রতিধ্বনিত হল, 'ভাববেন না দাদাবাবু। পৃথিবীর যে প্রান্তেই যান না কেন, আমরা সবাই আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকব। কেন না, আপনারা আমাদেরকে বড়ো ভালবাসেন।'

সত্যিই তো। ওদেরকে ভাল না বেসে কি পারা যায়? কতোদিন হল বাংলা-মায়ের কোল ছেড়ে এসেছি। কিন্তু আজও ওরা আমাদের পিছু ছাড়ে নি। 'বৃষ্টিতে নিশিকান্ত' গল্পের সেই নিশিকান্ত, 'ইচ্ছে'-র সাঁটুলাল, 'যতীনবাবুর চাকর'-এর পানু, 'মশা'-র সেই নফরচন্দ্র, 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু'-র মাখনলাল, 'ভুল'-এর বিধুভূষণ, 'চারুলালের আত্মহত্যা'-র সেই চারুলাল, 'ভেলা' গল্পের ধরিত্রী, 'গঞ্জের মানুষ'-এর সেই তিনপুরুষঃ গজমুর্খ ভেলুরাম, তার গো-মুর্খ ছেলে শোভারাম আর আকাটমুর্খ নাতি খেলারাম.....। 'মানবজমিন'-এর দীপনাথ আর প্রীতম, 'পার্থিব'-এর রামজীবন আর কৃষ্ণজীবনেরা যেন আজো সবাই আশেপাশেই রয়েছে।

অনেক অনেক বছর আগের কথা। তখন ছিল উঠতি বয়স। কোনো এক সন্ধ্যা-রাতে আকাশবাণী কোলকাতা থেকে একটি সাপ্তাহিক নাটক প্রচারিত হয়েছিল। নাটকের নাম 'কাগজের বউ'। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে। রুদ্ধশ্বাসে সবাই সেই কাগজের বউ শুনলাম। কি আধুনিক তার ধাঁচ, কি মনোরম তার কাহিনী, কি অবিশ্বাস্য রকমের চমৎকার তার গতি, কি অসাধারণ ট্র্যাজেডিময় তার পরিণতি! নাটক শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ আর কারো মুখে কোনো কথা ছিল না। এটা কি শুনলাম! এমন না হলে আবার নাটক! নাটকের রেশ বেশ ক'দিন ধরেই আমাদের মনের মধ্যে ছিল।

কিছুদিনের মাঝেই 'কাগজের বউ' নামের ঝক্‌ঝকে বইটি হাতে চলে এল এবং যথারীতি গোগ্রাসে তা গিলিতও হল। আর এ-ভাবেই ভালবাসার শুরু। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখার প্রতি ভালবাসা। যতোই পড়ি, ততোই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আর ভক্তিতে মাথা আপনা-আপনি নত হয়ে আসতে থাকে। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে, মাত্র দু'পাতা পড়তেই দু'ঘন্টা চলে গেছে। কারণ একেকটি বাক্য পড়ার পর অনেকক্ষণ ধরে শুধু ভাবতে হয়েছেঃ কিভাবে এমন করে উনি এ-সব লিখতে পেরেছেন! এ-রকম স্টাইল এর আগে আর কখনো তো চোখে পড়েনি! শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কি একজন যাদুকর? কথার, কিংবা স্টাইলের, কিংবা আধুনিক মননশীলতার?

না, তাঁকে মাপা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করাটাও বোকামী। অসাধারণ এক সাহিত্য-প্রতিভা নিয়েই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছে। অত্যন্ত উঁচু মানের আশিটিরও অধিক উপন্যাস, দু'শ'রও বেশী গল্প, আর অসংখ্য নিবন্ধের এই লেখককে পুরোপুরি আত্মস্থ করা সম্ভবপর নয়। অনেকটা অন্ধের হস্তী দর্শনের অপচেষ্টার মতোই তা হবে হাস্যকর।

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতো এত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লেখক বাংলা সাহিত্যে বিরল। গদ্য সাহিত্যের সব শাখায় তিনি

সিদ্ধহস্ত। উপন্যাস, ছোটগল্প ও গদ্য সাহিত্যের অন্যান্য সকল ধারায় তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যকে করেছেন অবিশ্বাস্য রকমের সমৃদ্ধ। তাঁর রচিত সাহিত্য-সম্ভার আকারে বিশাল এবং গুণগতভাবে অপূর্ব ও অসাধারণ। তাঁর অক্লান্ত লেখনী আজও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস সম্পর্কে বর্তমান কালের একজন অগ্রগণ্য সাহিত্য সমালোচক লিখেছেনঃ *'নদীর কোন ভান নেই– শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক সত্তাতেও কোন ভণিতা নেই। এক প্রাণবন্ত শৈশবস্মৃতি, এক যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞান-সংকট এবং শান্ত নিরাসক্ত অবলোকন– সবার উপরে এক সর্বতোসুভদ্র আস্তিক্য তাঁর লেখকজীবনকে গড়ে তুলেছে।'*

শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় একজন নিরামিষভোজী। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য এবং সহপ্রতিঋত্বিক। পাঠক হিসাবে সর্বগ্রাসী। তবে ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ প্রিয়, প্রিয় থ্রিলার এবং বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী।

বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই বাংলা ছোটগল্পের এক স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ছোটগল্পের সেই ফল্গুধারাটি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। কিন্তু যাঁদের গগনচুম্বী সাহিত্য-প্রতিভার গুণে সেই ধারাটি আবার ফুলে-ফেঁপে স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করল, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পর বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, মানবচরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, দর্শন, মানবসম্পর্ক ও নানা বৈচিত্র শীর্ষেন্দুর ছোটগল্পে নতুন করে ফুটে উঠতে শুরু করে। শিল্পমূল্যের দিক হতে শীর্ষেন্দু ও রবীন্দ্রনাথ– উভয়ের ছোটগল্পই সমপর্যায়ভুক্ত, যদিও এই দুই লেখকের রচনাশৈলী ও নির্মিতি-কৌশল একেবারেই ভিন্ন।

চারিদিকে অগণিত শব্দের ছড়াছড়ি। ধরে ধরে এনে কাগজের পাতায় বসিয়ে দিলেই তো কবিতা হয়ে যায়। বাহ্ কি মজা! কিন্তু সেই শব্দমালার সঠিকতম নির্বাচন আর সুন্দরতম বিন্যাস তো অতো সহজ একটি ব্যাপার নয়। সস্তা আবেগ আর নীচুমানের চমক সাহিত্যের পাতায় স্থান পেতে পারে না। সবার উপরে থাকতে হবে ভাবের ঘনঘটা। আবেগ থাকবে নিয়ন্ত্রিত, চমক হবে পরিশীলিত। আর সাদামাটা বানানে ভুল হলে তো আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না! গোড়াতেই সোজা খারিজ হয়ে যায় সেই সব 'কবিতা' নামের শব্দসমষ্টি। এখন প্রশ্ন হল, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কি একজন কবি? উত্তরে বলতে হয় যে, তিনি তার চেয়েও অনেক বেশী। আক্ষরিক অর্থে তিনি হয়তো কবিতা রচনা করেন না। তবু তাঁর প্রতিটি রচনার প্রতিটি ছত্রই কবিতার চেয়েও বেশী বাঙ্ময়, ধ্বনিময়, সুরেলা, অর্থবহ আর হৃদয়গ্রাহী। তাৎক্ষণিক উদাহরণ হিসাবে তাঁর দু'টি ছোটগল্প 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু' ও 'আবার দেখা হবে'-র কথা উল্লেখ করা যায়। (তাঁর নিজের মুখেই শোনা যে, দ্বিতীয় গল্পটি কোলকাতার সাহিত্য মজলিশে আবৃত্তিকাররা আবৃত্তি করে থাকেন।)

সিডনীর একঘেঁয়ে ছকে বাঁধা জীবন। সকালে ঘুম থেকে ওঠো। কাজে যাও। বাসায় ফেরো। বাচ্চার হোম ওয়ার্ক নিয়ে বসো। খাও-দাও, ঘুমোতে যাও। সপ্তাহান্তে বড়ো মাপের শপিং করো, বিস্তর রান্নাবান্না আর কাপড়কাচা সারো, গাড়ী ধোও, ঘাস কাটো। হাজার রকমের কাগজে চোখ বোলাও, আর তাদের একটা করে সুরাহা করো– শত রকমের পেমেন্ট বিল, গাড়ীর রেজো, ইন্স্যুরেন্স্, ট্যাক্স, বাচ্চার স্কুলের চিঠি।.... বড্ড কঠোর বাস্তবতার ঘেরাটোপে আট্‌কা পড়া এই জীবনযাত্রা! প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। ঠিক আছে, একটু ইন্টারনেট চষা যাক। বাংলা ওয়েবসাইটগুলোতে ঢুঁ মারলে নিমেষেই চারিদিকের চালচিত্র ভেসে ওঠে। আসলেই ভেসে ওঠে কি পুরোটা? কিছুটা হয়তো ওঠে। ইন্টারনেটের মুক্ত আকাশে কবুতরের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে কবিতা উড়ে বেড়াচ্ছে। দিস্তা দিস্তা নিবন্ধ তথা 'লিখিত চিন্তা-

ভাবনা' হামানদিস্তার মতো ধাপুর-ধুপুর করে উঠে পরক্ষণেই আবার দ্রুতবেগে বিসর্জিত প্রতিমার মতো তলিয়ে যাচ্ছে।

না, এসব আপাততঃ থাক। বরং 'গল্পগুচ্ছ'-র বিশাল পুচ্ছটা নিয়ে একটু টানাটানি করা যাক। তিন্ তেরে না রবীন্দ্রনাথ, ধরাপৃষ্ঠ হল কুপোকাত্। 'এই যে দ্যাখো গিন্নী, কোন্ ব্যাটা বলেছে যে, কবিগুরু বিপ্লবী ছিলেন না, বৃটিশবিরোধী ছিলেন না! এই যে পড়ে দ্যাখো।' 'এখন আমি বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছি। তুমিই না হয় পড়ে শোনাও।' সুতরাং 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের আপোষহীন নায়ক শশিভূষণের হৃদয়বিদারক কাহিনী পঠিত হলঃ *'প্রভূত্বমদগর্বিত উদ্ধত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎসমক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিবেন'....* , ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সূক্ষ্ম রসবোধের কথাই ধরা যাক। বেছে নেয়া যাক 'মধ্যবর্তিনী' গল্পটিঃ *'....আহারান্তে রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত নিবারণের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়-ভাত পাঠানো, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচকিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে-সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে তাহা এ-পর্যন্ত কোনো কবি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই, এবং সেজন্য নিবারণের মনে কখনো ক্ষোভের উদয় হয় নাই।'* 'ফেল' গল্পের কঠোর পিতা নবগোপালের অত্যাচারে জর্জরিত পুত্র নলিন সম্বন্ধে বর্ণনাঃ *'এমন সময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন।'* কি রসিক লেখক রে বাবা!

শীর্ষেন্দু মুখোপধ্যায়ের সাথে সাউদার্ন হ্যামিস্পিয়ারে সুবিখ্যাত ল্যান্ড মার্ক অপেরা চত্তরে সপরিবারে লেখক

থাক, কবিগুরুকে এবার একটু বিশ্রাম দেওয়া যাক। বৃদ্ধ মানুষ। এবারে বরং একটু শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় চর্চা করা যাক। আর তা ছাড়া সিডনীর মাটিতে শীর্ষেন্দু আরো জমবে ভাল। কি নেই তাঁর লেখাতে! গল্‌ফ্ খেলা, গ্লোব্যাল ওয়ার্মিং, পরিবেশ দূষণ, ইন্টারনেট, বিবাহহীন সমাজ, নিশিপল্লী। আবার রসিক বাঙ্গালের কাককে রুটি খাওয়ানো, দীপনাথের পাহাড়ে চলে যাওয়ার আকাংখা, বক-তপস্বীর শেয়াল ভক্ষণ, ছাতার সঙ্গে নিশিকান্তর প্রেম।.....

একদিন সিডনী থেকে কোলকাতায় ডায়াল করা গেলঃ 'দাদা, আমি রাজশাহী শহরের যে মহল্লায় বড়ো হয়েছি, সেখানে ক্লাশ টু পর্যন্ত পড়া খুব সহজ-সরল এক পাড়াতুতো চাচা ছিলেন। এই চাচা আর বাচ্চা-কাচ্চাকে ছেড়ে একদিন চাচী অন্য এক লোকের হাত ধরে ভেগেছিল। কিন্তু এতকিছুর পরও চাচী সম্বন্ধে চাচা বলতেন, 'সে যদি পালিয়ে গিয়ে সুখে থাকে, তবে থাক না! আমি আপত্তি করার কে?' তো আপনার 'ইচ্ছে' গল্পের সাঁটুলাল নামের লোকটির চরিত্র আমাদের সেই চাচার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আমার প্রশ্ন হলঃ কলকাতায় বসে আপনি রাজশাহীর এক মহল্লাবাসী চাচার সেই অবিকল চরিত্রটি খুঁজে পেলেন কিভাবে?' টেলিফোনে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বিনম্র হাসি-মেশানো যাদুকরী কণ্ঠঃস্বরটি ভেসে এলঃ 'ব্যাপার হল, এক সময় আমি কোলকাতার এক বস্তির খুব কাছাকাছি থাকতাম। সেই সময় বস্তিবাসী মানুষগুলোকে খুব কাছে থেকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করার একটা সুযোগ আমার হয়েছিল। তো তাদের-ই একজন ছিল এই সাঁটুলাল। সব জায়গাতেই এই শ্রেণীর কিছু কিছু মানুষের মধ্যে এক ধরণের সাযুজ্য প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায়। আর এটিই হল গুহ্য কথা।'

একজন সাহিত্যিককে অনেকটাই চেনা যায় তাঁর রসবোধের বহিঃপ্রকাশের ভেতর দিয়ে। পাঠককে কাঁদানো তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কঠোর বাস্তবতার নিগড়ে বাঁধা আমাদের এই জীবনের পরতে পরতে যিনি অনুপম রসের সন্ধান পান এবং তাঁর সেই গভীর উপলব্ধিকে খুব সহজ ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তিনিই তো সফল সাহিত্যিক। এক্ষেত্রে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্বার্থকতা আকাশচুম্বী। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলঃ

ছোটগল্পঃ 'বৃষ্টিতে নিশিকান্ত'। ভূমিকাঃ নিশিকান্তর দারুণ বিস্মরণ! সেই সঙ্গে রদ্দিমার্কা তার হিসেবজ্ঞান। তার হিসেবজ্ঞানের বহর দেখে তার মনিব বিপিনবিহারী একদিন তার উপর মহাখাপ্পা হয়। লেখকের ভাষায়ঃ *বিপিন নিশিকান্তর মাথায় গাঁট্টা মেরে বলে— তোর কত বয়স খেয়াল আছে?*
—হুঁ-উ! নিশিকান্ত বলে— দেড় কুড়ি।
—দূর ভূত, এক কুড়ি তো টোকারই বয়স। তুই তো আমার চেয়েও বড়। পঞ্চাশের কাছাকাছি তো হবিই।
তাই হবে! বয়সের হদিস জানলে এ দশা হবে কেন তার!

আরেকদিনের কথা। ঝুম্ বাদলা ভেঙ্গে মহেন্দ্রর দর্জির দোকানে নিশিকান্ত গেছে মনিব-গিন্নী বউমণির জন্য চুয়া আনতে। সারা শরীর ভিজে একশা। বগলে যথারীতি না-খোলা ছাতা। হাতে চুয়া নিতে আসা বোতল। লেখকের ভাষায়ঃ *মহেন্দ্র কল চালাতে চালাতে বলে* (নিশিকান্তর উদ্দেশ্যে)*— ছাতাটা তো সারা জীবন বগলেই দেখলাম। কোনোদিন খুলেছো?*
—খুলি মাঝে মাঝে, রোদে শুকোতে যখন দিই।
মহেন্দ্র হাসে। বলে— নিশি, ছাতাটা তো ভোগে লাগালে না। তবে কেন বয়ে বেড়াও হে?
—কাজে লাগে। নিশিকান্তর উদাস উত্তর।
মহেন্দ্রর শাগরেদ গুপে পাটির ওপর বসে একটা জামার কলার ঠিকঠাক করছিল। সে দাঁতে কামড়ানো ছুঁচটা বের করে হাসল, বলল— কাজটা কী?
—সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাতেই কাজে লাগে।
গুপে আর মহেন্দ্র নিজেদের মধ্যে একটু চোখ ঠারাঠারি করে।

উপন্যাসঃ 'চক্র'। ভূমিকাঃ ধীরেন কাষ্ঠ এখন বৃদ্ধ। কিন্তু আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে সে ছিল একজন তরতাজা জোয়ান। কালোর মধ্যেও নাকি ভারী সুন্দর চেহারা ছিল তার। ম্যাট্রিক পাসটা করেছিল কোনোক্রমে, তারপর অর্থকষ্টের দরুন আর পড়া হল না। শেষ পর্যন্ত পাশের গাঁয়ের বরুণ মিদ্দারের কাছে মৃদঙ্গ, খোল, দোতারা এইসব তৈরীর কাজ শিখতে আরম্ভ করল ধীরেন। মিদ্দার ছিল হাঁফি রুগি। শীর্ষেন্দুর

ভাষাতেঃ *তবে মিদ্দারের ঘরে ছিল কালনাগিনী। যেমন তার লকলকে চেহারা, তেমনই তার ঠাটঠমক। চোখের ভিতর থেকে যেন ইলেকট্রিক ঠিকরে আসত। বাপ রে! প্রথম প্রথম দেখে তো ভয়ই খেয়ে যেত ধীরেন। এই ফুটন্ত যুবতী বউকে সামলায় কী করে রোগাভোগা বরুণ মিদ্দার! কারণে অকারণে তাদের কাজের ঘরে এসে উদয় হত বাতাসী। দু হাত তুলে খোঁপা ঠিক করত— তাতে বুকখান ঠেলে উঁচু হয়ে উঠত বেশ, অকাজের কথা বলে বলে ভাব করত ধীরেনের সঙ্গে। বরুণ মিদ্দার কিছু বলত না। তবে মুখ দেখে মনে হত বউ নিয়ে তার স্বস্তি নেই। কিছুদিনের মধ্যেই ইশারা ইঙ্গিত শুরু করে দিল বাতাসী। সুরেলা গলায় উঠোন থেকে হয়তো একটু রসের গান গেয়ে উঠল, বা ছাগলছানাটাকে কোলে নিয়ে এমন সব কথা বলে আদর করত যা ছাগলছানাকে বলার কথা নয়।*

দিনের উষ্ণতম প্রহরে নগরীর ব্যস্ততম মোড়ের একেবারে নীরস পরিবেশের বর্ণনাও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখনীর আঁচড়ে হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য। ছোট গল্পঃ 'ভুল'। ভূমিকাঃ বিধুভূষণ নামক চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক বাস ধরার জন্য বার বার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আবার অনেক বাস অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাইয়ের কারণে বাস-স্টপে থামছিলও না। তাঁর ভাষায়ঃ *অবশেষে একটা বাস থামল। 'নামতে দিন আগে—' হাঁকল কন্ডাকটর। সে দিকে কান না দিয়ে বিধুভূষণ সকলের সঙ্গে একজোটে ঢেউয়ের মতো ঝাঁপ খেলেন। কে নামল, কে উঠল তা তিনি বুঝলেন না, কিন্তু বাসটা ছেড়ে দেওয়ার পর বুঝলেন যে, তিনি উঠতে পারেননি।*

ছোটগল্পঃ 'চারুলালের আত্মহত্যা'— *যে স্টপেজে নেমেছিল আবার সেই স্টপেজের দিকেই ফিরে আসছিল হিরণ। পুরানো বইয়ের দোকানের ধার ঘেঁষে, ফড়ে, দোকানী, ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ের ভিতর দিয়ে ইঁদুরের মতো দ্রুত গর্ত খুঁড়ে এগোতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল কলেজ স্ট্রীটে মন্থর একটি ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হচ্ছে। 'ধুত্তোর' বলে ট্রাম-বাস থেকে নেমে পড়ছে লোক। 'শালার মিছিল'— হিরণের প্রায় কান ঘেঁষে একজন চলতি মানুষ বলে গেল।*

ক্রমশঃ

লেখাটির বাকি অংশ পড়তে এখানে টোকা মারুন